প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

উম্মে ফারুয়া

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও সুরক্ষা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নানা নিরাপত্তা ও তাদের সুরক্ষার লক্ষ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে এ প্রকল্প। দরিদ্র, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেবার বিশেষ ট্যুল হিসেবে কাজ করছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তার ইতিহাস অনেক পুরোনো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সচল রাখা। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

দেশের তৃণমূলের বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে 'পল্লী সমাজসেবা' নামে কার্যক্রম শুরু হয়। 'পল্লী সমাজসেবার' আওতায় বাংলাদেশ সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের সূত্রপাত হয় যাকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের সূতিকাগার বলা যায়। এ কার্যক্রম দেশের প্রান্তিক জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে যুগান্তকারী ইতিহাস। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কার্যক্রম দেশের সর্বপ্রথম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম যা ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় চালু করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের অবকাঠামো, শিল্প কারখানাসহ সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। জাতির পিতা ধ্বংসস্তুপ থেকে দেশকে টেনে তুলে জনগণের দুর্দশা লাঘবে রেশন, খোলাবাজারে ভোগ্যপণ্য বিক্রি এবং রিলিফ বিতরণ কর্মসূচি চালু করেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তু ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন- যাতে নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। সরকার সবসময় নাগরিকের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে, আর্থিক অনটনে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে না বা বাসস্থানের অভাবে বাস্তুহীন বসবাস করবে এটা কাম্য হতে পারে না। তাই কল্যাণ রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমাজে বসবাসের জন্য আইনগত অধিকারকে ছাপিয়ে মানুষের আর্থিক, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের নিরাপত্তা সামনে চলে এসেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(১) এ আছে; কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। সে প্রেক্ষিতে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সকল প্রকার বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম, ক্যান্সার কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, চা শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, সুদমুক্ত ঋণ ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিভিন্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবেচনা ও উপস্থাপন করেছে। তবে এর মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে তাঁর প্রধান দশটি অগ্রাধিকার কর্মসূচির অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল অংশীজন হলো জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন কারণে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। এদের জীবনমানের উন্নয়ন ব্যতীত উন্নয়নশীল বাংলাদেশ বা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। সে আলোকে সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ঠিক করা হয়েছে। এ কৌশল অনেকটা মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধতাড়িত।

বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১৪৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৪৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন মানে হলো ১৪৫ শ্রেণির মানুষ এ খাত থেকে উপকৃত হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসেব মতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪৫টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৮ কোটি ১০ লক্ষ লোক কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রধান ৯টি খাত হলো- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন, খোলাবাজারে খাদ্য শস্য বিক্রয় (ওএমএস), কাজের বিনিময়ে খাদ্য/টাকা, টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি, শিক্ষাবৃত্তি, উপবৃত্তি, বয়স্কভাতা ও ভিজিডি। এ ৯টি খাতে সরকারের ব্যয় হয় বরাদ্দের প্রায় ৭০ শতাংশ। আর সুবিধাভোগীর ৭০ শতাংশ হলো খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়, ভিজিএফ, জিআর, উপবৃত্তি ও অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচি-এ ৫টি খাতে।

অর্থমন্ত্রণালয়ের এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৯৮ সালে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জিডিপি'র ১.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ২.৩ শতাংশ হয়েছে। এরপর থেকে বার্ষিক বাজেট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও এ খাতে বরাদ্দ জিডিপি'র ২ শতাংশের অধিকই রাখা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে ৩০,৬৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৪,৬৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ জিডিপির ৩.০১ শতাংশ এবং বাজেটের ১৬.৮৩ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৭৩.২ কোটি টাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাবে উত্তরাঞ্চলের 'মঙ্গা' দুরীভূত হয়েছে। ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ শতাংশ, ২০০৫ সালে ৪১.৫ শতাংশ, ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ, ২০১৫ সালে ২৪.৮ শতাংশ ও সর্বশেষ ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। যে দেশে এক সময়ে মানুষ কাজ না পেয়ে অনাহারে দিন কাটিয়েছে সেখানে এখন গ্রামগঞ্জে কাজের লোক পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর আওতায় ৭৮ লক্ষ গ্রামীণ বেকার মজুরের জন্য ৪০ দিনের কর্মসংস্থান করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের আরেকটি উৎস কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ২০ লক্ষ ৩১ হাজার মেট্রিকটন খাদ্যশস্য ও ৪১৬৬ কোটি টাকার বিনিময়ে বিগত ১০ বছরে ১ কোটি ৬২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এসময়ে বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বিশেষত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন অগ্নিকান্ড ইত্যাদি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ মানুষ খাদ্য সহায়তা পেয়েছেন এবং ১ কোটি ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার মানুষ ১৯৩ কোটি টাকার অর্থ সহায়তা পেয়েছেন। সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ছিল যে কোনো মানুষ যাতে দুর্যোগ-দুর্বিপাকে খাদ্যকষ্ট না পায়।

কোভিড-১৯ এ যখন পুরো পৃথিবী বিপর্যস্ত ঠিক সেসময় দেশের দরিদ্র ও অসহায় জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে সরকার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০০টি উপজেলায় শতভাগ বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এই তিনটি ভাতায় নতুন করে উপকাভোগী যুক্ত হবেন ১১ লাখেরও অধিক দরিদ্র ও অসহায় জনগণ। করোনাকালে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে প্রান্তিক পর্যায়ে দরিদ্র ও অসহায় জনগণ। তাদের মধ্যে বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। এদের কথা বিবেচনায় নিয়ে সরকার বিভিন্ন ধরনের ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, যা করোনায় এই ক্রান্তিকালে দরিদ্র জনগণের খাদ্যের নিশ্চয়তা দিয়ে তাদেরকে অনেকটা নির্ভর রাখতে সক্ষম হবে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সৃষ্টি দুর্যোগ সারাদেশে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দুই লাখ ১৪ হাজার ৯৩৯ মেট্রিকটন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৯৮ হাজার ৪৫১ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগীর পরিবারের সংখ্যা এক কোটি ৭০ লাখ ৪০ হাজার ৮৪১ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা সাত কোটি ৪১ লাখ ৩২ হাজার ৩১২ জন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী শিশুখাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রায় ১২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৯৮ কোটি ৮ লাখ ৫৪ হাজার টাকা।

কাজের সংস্থান হওয়ায় মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা ও বৈচিত্র্য বেড়েছে। খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অক্ষর জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রাণিত হয়েছে। ২০০৯ সালের সাক্ষরতার হার ৫৬.৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৭৪.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ সালে ২০৬৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার একটি বড়ো অংশ দেখাশোনা করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। দুস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা সেবা দিয়ে থাকেন এ মন্ত্রণালয়। তাদের মূল কর্মসূচিগুলোর মধ্যে হলো- বয়স্কভাতা (৪৯ লক্ষ জন), বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা (২০ লক্ষ ৫০ হাজার জন), অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা (১৮ লক্ষ জন), প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি (১ লক্ষ) ও এতিম শিশুদের ক্যাপিটেশন গ্রান্ট (৯৬,৬৭৬ জন)।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিশ্বের প্রায় সকল দেশে বিভিন্ন আকারে ও ধরনের বিদ্যমান আছে, বিদ্যমান থাকবে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত গরিব ও অসহায় মানুষদের নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আবেষ্টিত। আবার সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশনসহ অন্যান্য সুবিধাও দেওয়া হয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই উন্নত দেশেও এর প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য এর পরিধি বিস্তৃত হোক-এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

#

০৯.০৯.২০২০ পিআইডি ফিচার